যুগান্তর

তারিখ ০৭ ২০০২
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৫

মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর

ঢাবি সঙ্কট : আমরা কী শিক্ষা নিতে পারি?

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাম্প্রতিক ঘটনা দেশে ব্যাপকভাবে আলোচিত হয়েছে। এরকম ঘটনা এদেশে আর ঘটেনি। এই ঘটনা থেকে সরকার, ছাত্রসমাজ, বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন যার যার মতো শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। কে কী শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে তা নিয়ে বিস্তারিত পর্যালোচনার সুযোগ রয়েছে। এখানে সংক্ষেপে তার ওপর আলোকপাত করছি।

সরকার : ঘটনার বিভিন্ন ভাষ্য শুনে বা পড়ে মনে হয়েছে ২৪ জুলাই মধ্যরাতে শামসুন্নাহার হলে কারা পুলিশি অভিযানের নির্দেশ দিয়েছে তা এখনও স্পষ্ট নয়। কয়েক রকম ভাষ্য শোনা গেছে। তদন্ত কমিটির রিপোর্ট না পাওয়া পর্যন্ত এ ব্যাপারে নিঃসন্দেহ হওয়া যাবে না। নানা ভাষ্যের মধ্যে একটা ভাষ্য হল : 'একজন প্রতিমন্ত্রীর নির্দেশে আবাসিক হলে পুলিশ ঢুকেছে।' এর সত্য-মিথ্যা পক্ষে বলা মুশকিল। তবে এটা সত্য যে, পুলিশ উঁচু কোন, মহলের নির্দেশ ছাড়া মধ্যরাতে ছাত্রীদের আবাসিক হলে অপারেশনে যেতে সাহস পেত না। পুলিশকে কে কে নির্দেশ দিতে পারে? স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, আইজি, ভিসি? এর নিচে কারও নির্দেশে পুলিশ এত বড় অপারেশনে কি যাবে? তাহলে বলতে হবে এই চারজনের একজন নির্দেশ দিয়েছেন। যিনি নির্দেশ দিয়েছেন তিনিই মূল আসামি। পুরো ঘটনার জন্য সবচেয়ে বড় শাস্তি হতে হবে তার। ভিসি অবশ্য শাস্তি পেয়েই গেছেন। তবে তদন্ত রিপোর্টে যদি ভিসি অপরাধী প্রমাণিত না হন, তাহলে কী হবে? অবশ্য বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের প্রধান হিসাবে তিনি পরিস্থিতি সামাল দিতে ব্যর্থ হয়েছেন, ঘটনা সম্পর্কে এক একদিন এক এক কথা বলেছেন, সাধারণ ছাত্রদের আন্দোলনকে বহিরাগতদের আন্দোলন বলে হেয়প্রতিপন্ন করেছেন, নিজে সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি শান্ত করার চেষ্টা করেননি, আমলাতান্ত্রিক উপায়ে ঘটনা নিয়ন্ত্রণ করতে চেয়েছেন– এসব নানা ব্যর্থতার যোগফল তার পদত্যাগ। এই পদত্যাগ পরিস্থিতি তিনি নিজেই সৃষ্টি করেছেন। তিনি যদি পুলিশ অপারেশনের নির্দেশ নাও দিয়ে থাকেন তবু এই ঘটনা তাকে রেহাই দিত না।

সরকারের একজন যদি এই নির্দেশ দিয়ে থাকেন তাহলে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে নতুন একটা নিয়ম চালু করতে হবে। এ ধরনের পুলিশি অপারেশন একজনের নির্দেশে কার্যকর করা যাবে না। মন্ত্রী, আইজি ও প্রতিষ্ঠান প্রধানের যৌথ নির্দেশ হতে হবে। সম্ভব হলে ও পরিস্থিতি বেশি উত্তেজক মনে হলে ক্ষমতাসীন দলের মহাসচিবেরও অনুমোদন নিতে হবে। মহাসচিবের সঙ্গে পরামর্শ করতে হবে। কারণ, এ ধরনের ঘটনা ভুলভাবে পরিচালিত হলে তা সরকার পতনের আন্দোলনে গড়াবার আশঙ্কা থাকে। একজন স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী বা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসির ভুল সিদ্ধান্তের কারণে এত বড় ঝুঁকি কোন সরকার নিতে পারে না। এটা বিএনপি বা আওয়ামী লীগ সব সরকারের জন্য প্রযোজ্য।

সরকারকে দেখতে হবে কার স্বার্থ সে রক্ষা করবে। কোন ঘটনায় জড়িত তার কয়েকজন সমর্থক বা কর্মী না সাধারণ ছাত্রছাত্রী? শামসুন্নাহার হলের ঘটনার দিকে যদি তাকাই তাহলে এটা স্পষ্ট হয় যে, সরকার তথা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন হলের বহিরাগত কয়েকজন ছাত্রদল নেত্রীর জেদ রক্ষার জন্য এত কাণ্ড ঘটিয়েছে। এখন মাসুলটা কে দিল? এবং কতটা দিতে হল তা কি ক্ষমতাসীন দল একবার পর্যালোচনা করে দেখবে? ২৩৫ নম্বর রুমের সেই ছাত্রদল নেত্রীদের স্বার্থ রক্ষা করা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের জন্য এতটা জরুরি হয়ে পড়েছিল কেন? এখন তারা কোথায়? মূল দলে তাদের পৃষ্ঠপোষক কে বা কারা তাদেরও চিহ্নিত করা দরকার। আওয়ামী লীগ আমলেও দেখেছি, এখনও দেখছি, ক্ষমতাসীন সরকার বা দল তাদের হাতেগোনা কয়েকজন সন্ত্রাসী নেতাকে রক্ষা করার জন্য সরকারের অনেক বড় ক্ষতিকেও মেনে নেয়। আমরা সাধারণ মানুষরা বুঝতে পারি না, সেসব কুখ্যাত ক্যাডার-নেতারা সরকারের জন্য এত অপরিহার্য কেন? বাংলাদেশে অনেকের ধারণা, বিগত আমলে আওয়ামী লীগ সরকার যদি বহুল সমালোচিত অন্তত তার পাঁচজন এমপি, নেতাকে শায়েস্তা করতে পারত তাহলে ২০০১-এর নির্বাচনে তার জয়লাভ সম্ভব ছিল। এই ধারণা খুব অমূলক তা মনে হয় না। তবু আওয়ামী লীগ পরাজয়বরণ করতেও রাজি, কিন্তু দলের পাঁচ সন্ত্রাসী নেতাকে শায়েস্তা করতে রাজি হয়নি। রাজনীতির এ এক রহস্য। দলের শীর্ষ নেতারা এসব সন্ত্রাসীর কাছে এক মায়াজালে বন্দি।

শামসুন্নাহার হলেও প্রায় এরকম ঘটনা ঘটেছে। এই ঘটনা থেকে সরকার বা ক্ষমতাসীন দল এই শিক্ষা নিতে পারে– 'দলের ক্যাডারদের আমরা ততক্ষণ রক্ষা করব যতক্ষণ সাধারণ ছাত্রছাত্রী তাদের বিরুদ্ধে অবস্থান নেবে না।' সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা যদি সংঘবদ্ধ হয়ে বিপক্ষে চলে যায় তখন সরকারকে সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের পক্ষে সরে দাঁড়াতে হবে। ক্যাডারের মায়া তখন ত্যাগ করতে হবে। এখানে আমি বারবার 'সাধারণ ছাত্রছাত্রী' কথাটা ব্যবহার করছি। 'বিরোধী ছাত্র সংগঠন' আর 'সাধারণ ছাত্রছাত্রী' সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিস। বিরোধী সংগঠনের ক্যাডারের সঙ্গে সরকারি ছাত্রদলের ক্যাডারের সংঘর্ষ ব্যক্তিগত স্বার্থকেন্দ্রিক। রাজনীতিকেন্দ্রিক নয়। সেই সংঘর্ষ 'আন্দোলনে' রূপ নেয় না কখনও। একই রকম পরিস্থিতি জাতীয় রাজনীতিতেও ঘটে। দুই দলের মধ্যে 'বিরোধ' আর 'গণআন্দোলন' এক নয়। হরতালের সময় যা যা ঘটে তা দুই দলের মধ্যে বিরোধ। সাধারণ মানুষ তাতে অংশ নেয় না। যেমন অংশ নিয়েছিল '৯০ সালে। কাজেই ক্ষমতাসীন দল বা বিশ্ববিদ্যালয়ের সরকারি দলের লেজুড় প্রশাসনকে বুঝতে হবে কোনটা দুই দলের বিরোধ আর কোনটা সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে বিরোধ। সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা যদি একবার একটা পজিশন নিয়ে ফেলে তাহলে তাদের দমিয়ে রাখা সম্ভব হয় না। বিশ্ববিদ্যালয় ও আবাসিক হল বন্ধ করে দিয়েও যে তা আর সম্ভব হয় না এবারের ঘটনায় তা আবার প্রমাণিত হয়েছে।

দুই. বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাম্প্রতিক ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের নানা শিক্ষা নেয়ার রয়েছে। জোরপূর্বক কিছু করতে গেলে হিতে বিপরীত হয়। শামসুন্নাহার হলের প্রভোস্ট ড. সুলতানা শফি আরও দু'মাস দায়িত্বে থাকলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সরকারি দলের স্বার্থ রসাতলে যেত না। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম অনুযায়ী আর মেয়াদ পূর্ণ হলে নতুন প্রভোস্ট নিয়োগ করা যেত। হলের হাউস টিউটর বা আবাসিক ছাত্রী বা বহিরাগত ছাত্রী যাদের দাবিতে বা পীড়াপীড়িতে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ড. সুলতানা শফির প্রভোস্ট পদ বাতিল করে দিতে উদ্যত হয়েছিল তা ঠিক কাজ হয়নি। তার জন্য ক্ষমতাসীন দলের বিশ্ববিদ্যালয় গ্রুপকে অনেক বড় খেসারত দিতে হয়েছে। যাদের দাবিতে ভিসি ড. সুলতানা শফিকে অপসারণ করতে চেয়েছিলেন তারা হলের অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি ও ড. সুলতানা শফি সম্পর্কে হলের সাধারণ ছাত্রীদের মনোভাব সম্পর্কে ভিসিকে ভুল তথ্য দিয়েছিলেন বলে প্রমাণিত হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন যদি শুধু নিজের গ্রুপের শিক্ষক বা ক্ষমতাসীন দলের ক্যাডারদের সুপারিশ অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন চালাতে চান তাহলে এরকম পরিস্থিতির মুখোমুখি হওয়ার আশঙ্কা থাকবে। শামসুন্নাহার হলের বিদ্রোহী হাউস টিউটররা বা প্রশাসনে দলীয় সহযোগীরা কি ভিসিকে রক্ষা করতে পেরেছেন? পারেননি। তাহলে শুধু তাদের পরামর্শে ভিসি পদক্ষেপ নিতে যান কেন? মনে রাখতে হবে, দলীয় সহযোগীর পরামর্শ একদেশদর্শী হবে। তিনি শুধু দলের বা গ্রুপের স্বার্থটা দেখেন। অবশ্য তাই বলে কি বিরোধী গ্রুপের পরামর্শ শুনতে হবে? না তাও নয়। দলীয় সহযোগীর পরামর্শ অবশ্যই ভিসি শুনবেন। কিন্তু পরিস্থিতি জটিল হলে দলনিরপেক্ষ শিক্ষকের, প্রাজ্ঞ শিক্ষকের বা হলের সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের সেন্টিমেন্ট বুঝতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন যেন মনে রাখে, বিশ্ববিদ্যালয় মানে 'ছাত্রদল' আর 'ছাত্রলীগ' নয়। এই দুটি গ্রুপ বরং সংখ্যালঘু। সংখ্যাগুরু হল সাধারণ ছাত্রসমাজ। তারাই বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রধান ফ্যাক্টর।

ড. আনোয়ারউল্লাহসহ বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সরকার মনোনীত দলীয় ভিসিরা এতকাল মনে করে এসেছেন ক্ষমতাসীন দলের ছাত্র নেতাদের সন্তুষ্ট (ঠিকাদারি ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা) রাখতে পারলে তাদের চাকরি পাকা। কিন্তু এবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনা প্রমাণ করেছে সাধারণ ছাত্রছাত্রীরাও কম ফ্যাক্টর নয়। তারা বেঁকে বসলে ভিসির চাকরি রক্ষা করা যায় না। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন এই ঘটনা থেকে শিক্ষা নেবে আশা করি।

কোন ঘটনাকে আন্ডারমাইন্ড করা ঠিক নয়। সাম্প্রতিককালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের যে আন্দোলন হয়ে গেল পদত্যাগী ভিসি তাকে খাটো করে দেখতে চেয়েছেন। তিনি একে 'বহিরাগতদের আন্দোলন', 'গার্মেন্টস-এর শ্রমিকরাও যোগ দিয়েছে' ইত্যাদি বলে পরিস্থিতিকে আখ্যায়িত করেছেন। এ ধরনের মন্তব্য না করাই ভাল। বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন একটা ঘটনা ঘটলে সুচিন্তিতভাবে একটু দেরিতে হলেও তার একটা ভার্সন বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ দিলে ভাল করবে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের ভাষ্যে কোন ব্যক্তি বা গ্রুপ বা গোষ্ঠীকে রক্ষা করতে যাওয়া বিপজ্জনক। ঘটনা একটা ঘটে গেলে প্রকৃত অপরাধী যেন শাস্তি পায় সেদিকেই কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি থাকা উচিত। শামসুন্নাহার হলের ঘটনায় ভিসি স্পষ্টত ২৩৫ নম্বর কক্ষের বহিরাগতদের রক্ষা করতে চেয়েছেন। কিন্তু তা করতে গিয়ে তিনি নিজেকে রক্ষা করতে পারলেন না। বহিরাগতরাও রক্ষা পাবে কিনা সন্দেহ।

বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে দলবাজির ঊর্ধ্বে উঠতে হবে। বর্তমান পদ্ধতিতে সেটা ১০০ ভাগ হয়তো সম্ভব হবে না। কিন্তু যতটা সম্ভব তা করতে হবে। নিরপেক্ষভাবে প্রশাসন পরিচালনা করতে গিয়ে ক্ষমতাসীন দলের কোপানলে পড়ে চাকরি হারাতে হলে তা অনেক সম্মানজনক। সাধারণ শিক্ষক ও ছাত্রদের কাছে সেই ভিসি স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। ড. আনোয়ারউল্লাহর মতো চাকরি হারালে তা সম্মানজনকও নয়, স্মরণীয়ও নয়।

প্রফেসর বদরুদ্দোজা চৌধুরী দলের কোপানলে পড়ে রাষ্ট্রপতির পদ হারিয়েছেন। কিন্তু সাধারণ মানুষের কাছে তিনি এখনও শ্রদ্ধেয়, সম্মানিত। কারণ তিনি দলের তাঁবেদারি করতে চাননি বলে রাষ্ট্রপতির পদ হারিয়েছেন- সবাই তা উপলব্ধি করেন। চাকরি হারানোর মধ্যেও দুরকম পথ রয়েছে। বীরের মতো চাকরি হারানো আর কাপুরুষের মতো চাকরি হারানো। যে কোন চাকরিই হারানোর ভয় থাকে। এখন ব্যক্তিকেই ঠিক করতে হবে কিভাবে চাকরি হারাবেন :

তিন. ছাত্রসমাজ : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাম্প্রতিক ঘটনায় সাধারণ ছাত্ররা এক ইতিহাস সৃষ্টি করেছে। যদিও এই ইতিহাস '৫২, '৬৯, '৭১, '৯০-এর সঙ্গে তুলনীয় নয়। অতীতের চেয়ে এই ঘটনা কিছুটা ব্যতিক্রমী। কারণ অতীতের সব ছাত্র আন্দোলনই পরিচালিত হয়েছে কেন্দ্রীয়ভাবে, ছাত্র সংগঠন বা 'ডাকসুর' নেতৃত্বে। এবারের আন্দোলন অবশ্য কোন বড় উপলক্ষ বা ইস্যু নিয়ে রচিত হয়নি। একটা আবাসিক হলের ঘটনা বা একজন ভিসির পদত্যাগ দাবিতে মাত্র আট দিন স্থায়ী এই আন্দোলন। '৫২, '৬২, '৬৯, '৭১ ও '৯০-এর আন্দোলনের প্রেক্ষাপট জাতীয়ভিত্তিক। সাম্প্রতিক ঘটনা তার সঙ্গে তুলনীয় নয় কোনভাবেই।

এই আন্দোলন থেকে ছাত্রসমাজ কয়েকটি শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। যার ভিত্তিতে তারা পরবর্তীকালে উচ্চ শিক্ষা বা বিশ্ববিদ্যালয়ভিত্তিক নানা ইস্যু নিয়ে আন্দোলন গড়ে তুলতে পারে।

ছাত্রদের প্রথম শিক্ষা হল: বিশ্ববিদ্যালয়ে তারা একটা শক্তি। 'ছাত্রদল' বা 'ছাত্রলীগই' একমাত্র শক্তি নয়। এই আন্দোলন তাদের মধ্যে একটা কনফিডেন্স সৃষ্টি করেছে। অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ ছাত্ররাও এই কনফিডেন্স অনুভব করতে পারেন।

লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, সাম্প্রতিক আন্দোলনে কোন 'নেতা' ছিল না। কোন ব্যক্তির নাম সামনে আসেনি। কারণ সাধারণ ছাত্রদের কোন দল নেই, নেতাও নেই। তবুও আন্দোলন পরিচালনায় কোন ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়নি। এটা একটা সাফল্য। আরেকটা সাফল্য হল: তথাকথিত ছাত্র সংগঠনগুলোকে তারা এই আন্দোলনের কাছে ভিড়তে দেয়নি। পেশাদার ছাত্র নেতা ছাড়াও যে আন্দোলন করা যায় তা এবার প্রমাণিত হয়েছে। তবে ভবিষ্যতে তাদের সতর্ক থাকতে হবে। এই আন্দোলন থেকে ফায়দা নেয়ার জন্য রাজনীতি পক্ষপাতদুষ্ট সংস্কৃতি কর্মীরা এর মধ্যে ঢুকে পড়তে চেয়েছিল। এ ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে। ছাত্রদের আন্দোলন ছাত্রদের করতে দিন। বুদ্ধিজীবী বা সংস্কৃতি কর্মীরা যদি কোন ইস্যুতে সমর্থন দিতে চায় তারা তাদের প্রেমিস থেকে তা দিতে পারে। ছাত্রদের ভেতরে যাওয়ার দরকার হয় না।

সাধারণ ছাত্রদের সামনে বহু ইস্যু রয়েছে। বিশেষ করে উচ্চ শিক্ষা, বিশ্ববিদ্যালয় পরিস্থিতি ও কর্মসংস্থান প্রসঙ্গে ছাত্ররা নানা গঠনমূলক দাবি নিয়ে আন্দোলন করতে পারে। এসব ইস্যুতে সভা-সেমিনার করে বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে মতবিনিময় করে নানা সুপারিশমালা তৈরি করে সরকারকে দিতে পারে। একটা ভিন্ন ভঙ্গির 'ছাত্র আন্দোলন' গড়ে তোলার বিরাট সম্ভাবনা রয়েছে। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়কে সন্ত্রাসমুক্ত করা ও সশস্ত্র ক্যাডারমুক্ত করার আন্দোলনও তারা শুরু করতে পারে। তবে আন্দোলনের জন্যও দরকার সংগঠন ও নেতা। ভিন্ন ভঙ্গিতে সেই সংগঠনও তৈরি করা যায়। সেই সংগঠন খালেদা জিয়া বা শেখ হাসিনার ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে বের করা সংগঠন বা নেতা নয়। সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা নিজেরা আলাপ-আলোচনা করে তৈরি করবে সেই সংগঠন। তবে এই সংগঠনের দুটি শর্ত থাকা উচিত বলে আমি মনে করি। ১. এই সংগঠন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক রাজনীতি নিয়ে কোন পজিশন নেবে না, ২. শুধু উচ্চশিক্ষা, বিশ্ববিদ্যালয় ও কর্মসংস্থান ইস্যুতে তাদের দাবি ও আন্দোলন সীমাবদ্ধ রাখবে।

যারা জাতীয় রাজনীতি নিয়ে কথা বলতে চায় তাদের জন্য বহু ছাত্র সংগঠন রয়েছে। তাছাড়াও এই ছাত্র সংগঠনের নেতা বা কর্মীরা জাতীয় রাজনীতি সম্পর্কে কিছু বলতে চাইলে তা ব্যক্তিগত অধিকারে বলবে, দলের ব্যানারে বলতে পারবে না।

একটি 'ছাত্রত্বকেন্দ্রিক' ছাত্র সংগঠনের রূপরেখা সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা ও মতবিনিময়ের সুযোগ রয়েছে। এরকম একটি প্লাটফরম গড়ে তোলার এক্ষুনি উপযুক্ত সময়। একটি ছোট ইস্যু নিয়ে সাধারণ ছাত্রদের এই 'ঐক্যকে' শেষ হতে দেয়া যায় না। আরও অনেক বড় কাজে এই ঐক্যকে লাগানো দরকার।

মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর : *সাংবাদিক ও কলামিস্ট*